দুরুদুরু

১

'তুমি সাপগাছ জানো?'

ছেলেটার সঙ্গে আমার আর-একটা নতুন দিন শুরু হল। বাঁ-হাত সব সময় মুঠো করে রাখে, যেন কিছু লুকিয়ে রেখেছে। গায়ে একটা ঢলঢলে গেঞ্জি, নীল রঙের হাফ প্যান্ট, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত কালো রবারের ওয়াটারপ্রুফ জুতো।

নদীর পাড়ে আমি বাঁধ দিতে ব্যস্ত। মুখ তোলার সময় পাইনি।

'তুমি সাপগাছ জানো?' বলেই আগের মতো আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সে বাঁ-হাতের মুঠো খুলে কীসের একটা টুকরো বার করে ডান হাতে নিল। বাঁধের কাঁচা মাটিতে উবু হয়ে বসে মাটির ওপর সেটা দিয়ে ছবি এঁকে আমাকে দেখাল— 'এই দেখো, সাপগাছ।'

এই নাকি সেই গাছের ছবি! বললাম, 'এরকম গাছ তুমি নিজে দেখেছ?'

'না হলে আঁকলাম কী করে?'

'কোথায় দেখেছ?'

ছেলেটা উত্তর দিল না। চুপ করে ভাবছে।

এই আষাঢ়ের শুরুতেই সুন্দরবনের নদীগুলো জলে ফুলছে। নদীর পাড়ে ভোর থেকে আমি গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটির বাঁধের ফাটল মেরামতির কাজে হাত লাগিয়েছি।

ছেলেটা হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। কোথায় থাকে, পাশের গ্রামে, না নদীর ওপারের কোনও গ্রামে, তাও জানি না। গ্রামের মেয়ে-বউরা যারা সারাদিন এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে নদী থেকে চিংড়ির মীন ধরে, তাদের একজন বলে বাঁশের ভেলায় চড়ে তাকে এদিকে আসতে দেখেছে। জঙ্গলে যারা মৌচাক ভেঙে মধু আনতে যায়, তাদের কে-একজন নাকি একদিন দেখেছে ছেলেটা মহিষের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে বনের ধার দিয়ে গ্রামের দিকে আসছে।

নদীপাড় উঁচু করে না বাঁধালে একদিন দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে গ্রাম ভেসে যাবে। সবাই হাতে-হাতে মাটি বয়ে আনছে, ঝপাঝপ নদীর পাড় বরাবর চাপাচ্ছে, আমার কাজ মাটির স্তূপ ঠিকমতো সাজিয়ে নেওয়া। ফাটলগুলো বুঁজিয়ে দেওয়া। এ কাজে গ্রামের নানা বয়েসের মেয়েরাও আমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সারি সারি তারা কোমর ভেঙে কাদামাটি সমান করছে।

ছেলেটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল, এবার জেগে উঠে নিচু স্বরে বলল,

‘একটা দ্বীপ আছে। তার চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। সেই দ্বীপে আমি সাপগাছ দেখেছি। ভোরবেলা গাছটা নানা রঙের পাখির কিচিরমিচিরে যেন বাজনা বাজায়। সাপগাছটা কিন্তু কোনওদিন কোনও পাখিকে ছোবল দেয়নি। সাপগাছে ফুল হয় না কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফুলের গন্ধ তোমার নাকে লাগবেই।’

‘ফুল হয় না, তাহলে ছবিতে বড় বড় ওগুলো কী? ফুলের মতোই তো দেখাচ্ছে।’

‘ওগুলোই গাছটার পাতা।’

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, ‘কিন্তু দ্বীপটা যে কবে দেখেছি, কোথায় দেখেছি তা আর মনে পড়ে না। হয়তো কয়েকশো বছর আগে দেখেছি। বা হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে। হয়তো অনেক আগের কোনও জন্মে দেখেছি দ্বীপটা। আমি কী করে গিয়েছিলাম, চেষ্টা করেও মনে করতে পারি না।’

ছেলেটা কি তবে জাতিস্মর, না কি মানুষই না, আমার সামনে এ কি তবে জিন বা ভূত? সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কয়েকশো বছর বা কয়েক হাজার বছর আগের কথা কি কেউ মনে করতে পারে? ওরকম হয় নাকি?’

‘হতে পারে না? কারও জীবনেই হতে পারে না?’

‘অসম্ভব।’

বিকেল শেষ হয়ে আকাশে পাতলা সন্ধে নামছে, সন্ধ্যাতারাও ততক্ষণে ফুটে গেছে, সেদিকে আঙুল তুলে ছেলেটা বলল, ‘এই তারাটা লক্ষ-কোটি বছর ধরে আছে তো? অথচ আজও একইরকম দেখতে পাই। আমার সেই দ্বীপও এই ভাবেই কোথাও কোনও মহাসাগরের বুকে জেগে আছে, যখন আমার সব মনে পড়বে তখন ঠিক আমি দেখতে পাব। পাব না? এই দেখো, আমার বুক দুরদুর করছে।’ বলেই নদীপাড়ের কাদার ওপর দিয়ে সে দূরে কোথাও চলে গেল।

ছেলেটা এরকম হঠাৎ কখনও আসে, হঠাৎ চলে যায়। রোজ কথা বলে না। যেদিন বলে সেদিন তার ভারি অদ্ভুত সব কথা না শুনে পারি না।

একদিন অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, ‘গাছ, পাখি, নদী আর আকাশের তারা ছাড়া মানুষ বাঁচে না জানো তো?’

কথাটা বলেই কিছুক্ষণ কী ভাবল। তারপর আবার বলল, ‘যে দেশে নদী নেই সে দেশের বড় দুঃখ। আমি দেখেছি। জানো তো, নদী মানুষের মায়ের মতো!’

হাতের কাজ থামিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে যুধিষ্ঠিরদাদা পিছন থেকে হাঁক পাড়ল, ‘ঘটনাটা কী ঘটল রে অমেরতো? ছোঁড়াটা আজ আবার কী চায়?’ আমার ভালো নাম অমর্ত্য। গ্রামের বয়স্করা আমাকে অমেরতো বলে ডাকে।

ছেলেটা ক’দিন ধরে প্রায়ই আমার কাছে আসছে বটে, কিন্তু কোনও দিন কিছু তো চায়নি। শুধু চারদিক দ্যাখে। কখনও কিছু মনে এলে, বলে আমাকে। একদিন যেমন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখি কিনা।

আর-একদিন, সেদিন শেষ রাত থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে বিকেলের দিকে আকাশ আলো করে সবে নদীর জলে শান্তি নেমেছে, পশ্চিমে দূর বনের মাথায় কমলা রঙের ছোপ ধরেছে, ছেলেটা কোথা থেকে এসে আমাকে বলল, ‘কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছ, বলো।’

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বললাম, 'কই কিছু তো দেখিনি।'

'দেখেছ। মনে করতে পারছ না।' একটু পরে আবার বলল, 'আমি রোজ স্বপ্ন দেখি। মা বলত, স্বপ্ন দেখার সময় আমার মুখ নীল হয়ে যায়। আমার নামও তাই স্বপ্ননীল। তুমি আমাকে দুরুদুরুও বলতে পারো।'

'তোমার নাম স্বপ্ননীল হলে তোমাকে দুরুদুরু বলব কেন?'

'আমার বুকটা মাঝে মাঝেই দুরদুর করে।'

'ডাক্তার দেখাও না? এ জন্য ওষুধ খাওনি কখনও?'

'বা রে, ওষুধ খাব কী করে? সাপগাছের তিন পাতার একেকটা গুচ্ছের একটা পাতাই এর ওষুধ। কিন্তু আমি তো গাছের পাতা ছিঁড়তে পারি না।'

সুন্দরবনের এই বানভাসি গ্রামে আমার পুরো ছয় ঋতু কেটে গেছে। এক বৈশাখে এসেছি, আরেক বৈশাখ পার হয়ে জ্যৈষ্ঠও শেষ হয়ে গেল। এসেছি স্কুলে পড়াবার কাজ নিয়ে। বানভাসির একমাত্র স্কুল এটা। নদীর নোনা জল ঠেলে সরিয়ে বাঁধ দিয়ে তার ওপর এই মাটির স্কুলবাড়ি বানিয়েছে গ্রামের মানুষ। মাটির দেওয়াল, টালির চালা। ছিল প্রাইমারি স্কুল। এ বছরই দশ ক্লাসের হয়েছে। আমিও সদ্য ছাত্রজীবন শেষ করে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেছি। স্কুলে পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নানা কাজেও হাত লাগাতে হয়। নদীর পাড় ভাঙা ঠেকাতে বনকাঁটা গাছ বহুদূর অব্দি শিকড় ছড়িয়ে মাটিকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। তার ডাল কেটে গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে লাগানোও একটা কাজ। সে কাজেও যখন যতটুকু পারি সাহায্য করি। গ্রামের সবার সুখদুঃখের শরিক হতে না পারলে বাইরের কাউকে গ্রামবাসীরাই বা বিশ্বাস করবে কেন!

একদিন বিকেলের দিকে ছেলেটা এল। এসেই বলল, 'সাপগাছের কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না, সেই দ্বীপে যাবার রাস্তাটা মনে করতে পারছি না তো।'

ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখায় ব্যস্ত ছিলাম, একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বেশ তো, যেদিন দ্বীপের রাস্তা মনে পড়বে সেদিনই না হয় নিয়ে যেও!'

গলার স্বরে রুক্ষ ভাব সে ঠিকই বুঝেছে। না হলে সে বলবে কেন, 'আমার কথায় রাগ করবার মতো কিছু ছিল বুঝি?'

এতক্ষণ খাতায় চোখ রেখে তার কথা শুনছিলাম, উত্তরও দিয়েছিলাম সেভাবেই। এবার মুখ তুলে অবাক হলাম। কোথায় তার গায়ে সেই ঢলঢলে গেঞ্জি! তার বদলে এ তো দেখছি যেন কোন্ অরণ্যরাজ্যের ছেলে। গায়ে মরা ডালপালায় জড়ানো শুকনো লতা-পাতার লম্বা জোব্বা, মাথায় পাখির পালকের টুপি। পালকও নানা রঙের!

আমার আশ্চর্য হওয়া তার চোখেই পড়ল না। বরং আমাকে আরও আশ্চর্য করে বলল, 'সাপগাছের দ্বীপে তো নিয়ে যেতে পারব না, কিন্তু তোমাকে আমি পঞ্জীপেড় গ্রামে যাবার পথ বলে দেব। পঞ্জীপেড় বুঝেছ? পাখিগাছ। গ্রামের নামও পঞ্জীপেড়। পাখিগ্রামও বলতে পারো। ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের দেশে সেই গ্রাম। যাবে তুমি? যে মাসে সারাদিন আকাশে সূর্য রেগে থাকে, নীচে আগুন ঝরায়, মাটি শুকিয়ে ফাটা-ফাটা হয়ে যায়, সেই মাসে আসব আমি।'

প্রথমে বলেছিল সাপগাছের কথা। এখন আবার বলছে পাখিগাছের কথা। একটা কুয়াশাঘেরা দ্বীপে, আরেকটা জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ে, কথাগুলো বিশ্বাসও হয় না, আবার একেবারে উড়িয়েও দিতে পারি না।

(আংশিক)

প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯